দৈনিক ইত্তেফাক 25

বিদ্যালয়ে 'কোচিং ব্যবসা'

নিখিল রঞ্জন দাস

একালে পবিত্র স্থান হিসাবে এই দেশের বিদ্যালয়গুলির সমাজে যথেষ্ট সুনাম ছিল। ইহাতে কর্মরত শিক্ষকগণকেও জনসাধারণ শ্রদ্ধার চোখে দেখিত। তখন তাহারা সমাজে সম্মানজনক মর্যাদায় অধিষ্ঠিত থাকিয়া আন্তরিকতার সাথে শিক্ষাদানে নিমগ্ন থাকিতেন। যদিও সেইকালে উচ্চশিক্ষিত শিক্ষকের অভাব ছিল, কিন্তু ত্যাগী ও নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষকের কোন অভাব ছিল না। তখন তাহারা বাণিজ্যিক মনোভাবাপন্নের উর্ধ্বে থাকিয়া নৈতিক আচরণকে প্রাধান্য দিতেন বলিয়াই প্রতিটি শিক্ষাঙ্গন পবিত্র স্থান হিসাবে সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল।

কিন্তু বর্তমানে বিদ্যালয়গুলি আর সেই অবস্থানে নাই। এখন বাণিজ্যিক উপায়ে বিদ্যালয় পরিচালনা করা, রাজনৈতিক পঙ্কিলতা, যৌন নিপীড়নসহ হরেক রকম অনৈতিক কর্মকান্ডে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি স্বীয় পবিত্রতা হারাইতে চলিয়াছে। বর্তমানে নানাভাবে কলুষিত করা হইতেছে শিক্ষাঙ্গনের পবিত্র পরিবেশ।

আমাদের দেশে মাধ্যমিক শিক্ষার প্রায় ৯৮% পরিচালিত হয় বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির মাধ্যমে। আর এই স্তরেই শিক্ষা ব্যবস্থা সবচেয়ে বেশী নাজুক অবস্থায় আছে। শিক্ষা বিস্তারে বর্তমান সরকারের আন্তরিকতা থাকা সত্ত্বেও এই স্তরে দুর্নীতি দিন দিন মাথাচাড়া দিয়া উঠিতেছে। নানাবিধ অনিয়ম ও দুর্নীতি আজ গা-সহা হইয়া গিয়াছে। এই স্তরের বিদ্যালয়ের নানা প্রকার দুর্নীতির মধ্যে 'কোচিং ব্যবসা' অন্যতম। দুর্মুখেরা বলিয়া থাকেন, 'অভাবে স্বভাব নষ্ট'। ফলে নৈতিকতা বিবর্জিত এই কোচিং ব্যবসা দিন দিন জমজমাট হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু তাহা পুরাপুরি মানিয়া নেওয়া যায় না। পল্লী অঞ্চলের অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি না হয় তাহাদের অর্থনৈতিক দৈন্যদশা কাটাইয়া উঠিতে তাহা করিয়া থাকে, এমন অভিযোগ হয়তো মানিয়া নেওয়া যাইতে পারে; কিন্তু শহরাঞ্চলের সেইসব বড় বড় নামী-দামী বিদ্যালয়গুলির সেই সমস্যা নাই, সেইসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিও যে নানাবিধ দুর্নীতির সাথে কোচিং ব্যবসার মতো অনৈতিক কর্মকান্ডে জড়িত থাকে, তাহা প্রায়ই পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়া থাকে। তবে কি এইসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধিকাংশই আজ 'বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী'-এই আদর্শে বিশ্বাসী?

একালে কিছু নামী-দামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তাহাদের নির্বাচনী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষার মানোন্নয়নের জন্য এই কোচিং প্রথা চালু করিয়াছিল। তখন এইসব বিষয় নিয়া কোন মহল থেকেই তেমন কোন অভিযোগ উত্থাপিত হইত না। কারণ তখন ছাত্র-ছাত্রী বা তাহাদের অভিভাবকগণ শিক্ষকদের আন্তরিকতায় মুগ্ধ ছিলেন। ক্রমে সারাদেশের বিদ্যালয়গুলিতে যখন ব্যাঙের ছাতার মত এই কোচিং প্রথাটি চালু হইতে থাকে, তখন তাহা স্বকীয় বৈশিষ্ট্য হারাইয়া বাণিজ্যিক প্রথায় পরিগণিত হইতে থাকে। ফলে অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই আজ কোচিং ক্লাসের নামে 'কোচিং ব্যবসা' জমজমাট করিয়া তুলিয়াছে। কিন্তু এইসব হীন কার্যকলাপের সাথে বিদ্যালয়ের সাধারণ শিক্ষকগণ জড়িত নন বা তাহারা কোন আর্থিক সুবিধাও ভোগ করেন না। বিদ্যালয়ের কতিপয় দুর্নীতিবাজ শিক্ষক এবং কার্যনির্বাহী কমিটির কোন কোন সদস্য এইসব হীনকর্মকান্ডে জড়িত থাকেন। কোথাও কোথাও তাহা আন্তঃস্কুল প্রধান শিক্ষকদের সমন্বয় পরিষদের সিদ্ধান্তেই হইয়া থাকে।

এক বিদ্যালয়ের ফি-র সাথে অপর বিদ্যালয়ের ফি-রও কোন সামঞ্জস্য খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। অনেক গরীব ও অসহায় অভিভাবককে তাহাদের গরু-ছাগল বা জায়গা-জমি বিক্রয় করিয়া বা বন্ধক দিয়া কিংবা মহাজনের নিকট হইতে চড়া সুদে টাকা ধার আনিয়া এইসব ফি-র টাকা জোগাড় করিতে হয়। অর্থপিশাচ এই শিক্ষকদের কূটকৌশলের নিকট অসহায় গরীব অভিভাবকদের নীরবে অশ্রু বিসর্জন করা ছাড়া আর কোন উপায় থাকে না। অধিক ফি আদায়ের অভিযোগ প্রায়ই পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হইতেছে, কিন্তু কোন প্রতিকার হইতেছে না। সচ্ছল অভিভাবকগণ বা সংশ্লিষ্ট প্রভাবশালী মহলকে এই ব্যাপারে প্রায়ই নির্বিকার থাকিতে দেখা যায়। ফলে গোটা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানই কতিপয় দুর্নীতিবাজ শিক্ষকের হাতে জিম্মি হইয়া থাকে।

একজন ছাত্র বা ছাত্রীকে নির্বাচনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণের পূর্বেই বিদ্যালয়ের প্রাপ্য যাবতীয় ফি-র টাকা পরিশোধ করিতে হয়। নির্বাচনী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে পর তাহাদের শুধু বোর্ড নির্ধারিত ফি-র টাকা বিদ্যালয়ে জমা দিয়া পরীক্ষার ফরম পূরণ করিবার কথা। ১৯৯৯ সালের এস,এস,সি পরীক্ষার ফরম পূরণ বাবদ বোর্ড নির্ধারিত ফি বিজ্ঞান বিভাগে ৬১০ টাকা ও মানবিক বিভাগে ৫৫০ টাকা। কিন্তু বিদ্যালয়গুলিতে ফি আদায়ের কোন নির্দিষ্ট নীতিমালা না থাকায় তাহারা ইচ্ছামত ফি-র টাকা আদায় করিয়া থাকেন। আর বোর্ড নির্ধারিত ফি-র চেয়ে-বেশী অর্থ আদায়ের ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া ছাত্র-ছাত্রী বা তাহাদের অভিভাবকদের হাতে শিক্ষক লাঞ্ছিত হইবার মত অপ্রীতিকর ঘটনাও প্রায়ই ঘটিয়া থাকে। উল্লেখ্য যে, একজন পরীক্ষার্থী নবম ও দশম শ্রেণীতে অধ্যয়নকালে সেশন ফি-সহ বিদ্যালয়ের যাবতীয় পাওনা পরিশোধ করা সত্ত্বেও কোচিং ফি, অগ্রীম ছয় মাসের বেতন, বিদ্যালয়ের উন্নয়ন, খেলাধুলা ইত্যাদি নানা খাত দেখাইয়া পরীক্ষার্থীদের নিকট হইতে হাজার হাজার টাকা হাতাইয়া নিবার কোন যুক্তি আছে কি? বিদ্যালয়গুলি এইসব নানা খাত দেখাইয়া পরীক্ষার্থী প্রতি ২ হাজার হইতে ৩ হাজার টাকা পর্যন্ত আদায় করিয়া থাকে। কখনও কখনও এই টাকার পরিমাণ ৫/৬ হাজার টাকা পর্যন্ত গড়ায়। নির্বাচনী পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীদের নিকট হইতে উত্তীর্ণদের তুলনায় বেশী ফি নেওয়া হয়। নির্বাচনী পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীদের নিকট হইতে উত্তীর্ণদের তুলনায় বেশী ফি নেওয়া হয়। নির্বাচনী পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণর নিকট হইতে অকৃতকার্যে প্রতি বিষয়ের জন্য ১ হাজার হইতে ২ হাজার টাকা পর্যন্ত আদায় করিবার অভিযোগ অভিভাবকদের নিকট হইতে শোনা যায়। আর কোন পরীক্ষার্থীর পরীক্ষা সংক্রান্ত কোন কাজে যদি শিক্ষাবোর্ডে যাইবার প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে তাহাকে 'জুজুর ভয়' দেখাইয়া গলাকাটা অর্থ আদায় করা হইয়া থাকে। অথচ অধিক অর্থ আদায়ের কোন রসিদ দেওয়া হয় না। আবার এক বিদ্যালয়ের ফি-র সাথে অপর বিদ্যালয়ের ফি-রও কোন সামঞ্জস্য খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। অনেক গরীব ও অসহায় অভিভাবককে তাহাদের গরু-ছাগল বা জায়গা-জমি বিক্রয় করিয়া বা বন্ধক দিয়া কিংবা মহাজনের নিকট হইতে চড়া সুদে টাকা ধার আনিয়া এইসব ফি-র টাকা জোগাড় করিতে হয়। অর্থপিশাচ এই শিক্ষকদের কূটকৌশলের নিকট অসহায় গরীব অভিভাবকদের নীরবে অশ্রু বিসর্জন করা ছাড়া আর কোন উপায় থাকে না। অধিক ফি আদায়ের অভিযোগ প্রায়ই পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হইতেছে, কিন্তু কোন প্রতিকার হইতেছে না। সচ্ছল অভিভাবকগণ বা সংশ্লিষ্ট প্রভাবশালী মহলকে এই ব্যাপারে প্রায়ই নির্বিকার থাকিতে দেখা যায়। ফলে গোটা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানই কতিপয় দুর্নীতিবাজ শিক্ষকের হাতে জিম্মি হইয়া থাকে।

নির্বাচনী পরীক্ষার পরপরই কোচিং ক্লাসের নামে 'কোচিং ব্যবসা' জমজমাট হইয়া উঠে। আর এইসব ক্লাসে পরীক্ষার্থীর স্বার্থের চেয়ে কতিপয় শিক্ষকের ব্যক্তিস্বার্থই প্রাধান্য পায়। এইসব দুর্নীতিবাজ শিক্ষক নবম ও দশম শ্রেণীর দুই বৎসরের কোর্সে শ্রেণী পাঠদানে চরম অবহেলার পরিচয় দিয়া থাকেন এবং কোনরকম দায়সারাগোছের শ্রেণী পাঠদান শেষে ছাত্র-ছাত্রীদের কোচিং ক্লাসে পড়াইবার জন্য উৎসাহিত করিয়া থাকেন। ফলে শ্রেণী পাঠদান অসমাপ্ত থাকার কারণে ছাত্র-ছাত্রীরা কোচিং ক্লাসের উপর নির্ভরশীল হইয়া পড়ে। আর শিক্ষকদের অপ্রীতিভাজন হইবার ভয়ে তাহারাও বিনা প্রতিবাদে বা কখনও কখনও মৃদু প্রতিবাদে এইসব অতিরিক্ত অর্থ দিতে বাধ্য হইতেছে। কোচিং ক্লাসের নামে আদায়কৃত হাজার হাজার টাকা নিজেদের মধ্যে ভাগ-বাটোয়ারা করিয়া নেওয়া ইহার আসল উদ্দেশ্য। তাই তো দেখা যায় বিদ্যালয়ে অনেক দক্ষ ও প্রতিভাবান শিক্ষক-শিক্ষিকা থাকা সত্ত্বেও কতিপয় শিক্ষক নিজেদের মধ্যে এইসব ক্লাস বন্টন করিয়া নেয়। এইসব শিক্ষকের যোগ্যতা ও দক্ষতা সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন উত্থাপিত হইলেও কাহারও কোন কিছু করিবার থাকে না। অধিকাংশ 'গাইড নির্ভর' শিক্ষকের দ্বারা এইসব কোচিং ক্লাস পরিচালিত হয় বলিয়া শিক্ষার্থীরাও 'গাইড-নির্ভর' হইয়া উঠে। ফলে তাহারা তাহাদের নিজস্ব সৃজনী শক্তি হারাইয়া পরীক্ষায় নকলের প্রতি ঝুঁকিয়া পড়ে।

শিক্ষকনামধারী এইসব 'নব্য সোফিস্ট'দের কারণেই আজ বিদ্যালয়গুলি স্বীয় মর্যাদা হারাইয়া অবমাননাকর অবস্থানে পৌঁছিয়া যাইতেছে। আর একুশ শতকে মাধ্যমিক শিক্ষার মানোন্নয়নে যে কোচিং প্রথার প্রসারণতা বা বিলুপ্তির উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল তাহাতে বোধহয় কাহারও কোন সন্দেহ নাই। এই অবস্থার অবসান ঘটাইতে হইলে সকলকে সম্মিলিতভাবে ইহার প্রতিকারের উদ্যোগ নিতে হইবে। বিদ্যালয় নির্বাচনী পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের ফি-আদায়ের সুষ্ঠু নীতিমালা প্রবর্তন ও তার যথাযথ বাস্তবায়নের জন্য সরকারকে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে। সেইসাথে শ্রেণী পাঠদানকে প্রাণবন্ত করিয়া তুলিয়া শিক্ষার্থীদের স্বনির্ভর করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে, যাতে তাহারা নিজস্ব প্রতিভার জোরেই পরীক্ষার প্রস্তুতি নিতে পারে। পরিশেষে এইটুকু বলা যায় যে, যেইদিন শিক্ষাঙ্গনে আবার নৈতিকতা ফিরিয়া আসিবে, সেইদিন সকলের অলক্ষ্যেই হয়তো বিদ্যালয়গুলি তাহাদের স্বীয় পবিত্রতা ফিরিয়া পাইবে। আশা করি, সেইদিন আর বেশী দূরে নহে। ❑